# নন্দলাল বসু (১৮৮২–১৯৬৬) ও যামিনী রায়ের (১৮৮৭–১৯৭২)

# শিল্প-সাহিত্যচর্চায় ভারত-সংস্কৃতির প্রতিগ্রহণ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগের অধীনে পিএইচ.ডি উপাধিপ্রাপ্তির শর্তপূরণের উদ্দেশ্যে উপস্থাপিত গবেষণা সন্দর্ভের সংক্ষিপ্তসার


গবেষক : **তানিয়া মণ্ডল**

তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক : ড. সুমিতকুমার বড়ুয়া

বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়



**তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ**
**ফ্যাকাল্টি কাউন্সিল অফ আর্টস**
**যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়**
**কলকাতা: ৭০০০৩২**
**২০২৩**

আমার গবেষণার বিষয় ‘নন্দলাল বসু (১৮৮২–১৯৬৬) ও যামিনী রায়ের (১৮৮৭–১৯৭২) শিল্প-সাহিত্যচর্চায় ভারত-সংস্কৃতির প্রতিগ্রহণ’। গবেষণাপত্রটিকে উপস্থাপন করতে নিম্নলিখিত অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে –

ভূমিকা

প্রথম অধ্যায় – বিংশ শতাব্দীর নব্যবঙ্গীয় শিল্পচর্চার পূর্বাপর পরিস্থিতি

দ্বিতীয় অধ্যায় – লোকশিল্পানুষঙ্গ: নন্দলাল বসু ও যামিনী রায়

তৃতীয় অধ্যায় – বিদেশি অনুষঙ্গ: নন্দলাল বসু ও যামিনী রায়

চতুর্থ অধ্যায় – চিত্র-সাহিত্য: নন্দলাল বসু ও যামিনী রায়

পঞ্চম অধ্যায় – নন্দলাল বসু ও যামিনী রায়ের তুলনামূলক আলোচনা

উপসংহার

## ভূমিকা

ভারতবর্ষে চিত্রচর্চার ইতিহাস বহু প্রাচীন হলেও সেই ইতিহাস লিপিবদ্ধ করার প্রবণতা লক্ষ করা যায় না। তবে বেশ কয়েকটি প্রাচীন গ্রন্থে চিত্রশিল্পচর্চার উল্লেখ পাওয়া যায়। ভারতশিল্পের ইতিহাস সন্ধান করতে গিয়ে জানতে পারা যায় সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে মধ্যযুগ পর্যন্ত ভারতশিল্প নিজ ঐতিহ্য বজায় রেখে শিল্পক্ষেত্রকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ব্রিটিশদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর হলে ভারতবর্ষে পাশ্চাত্য শিল্পচর্চা শুরু হয়। বিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে শিল্পশিক্ষার প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলে সেখানে পাশ্চাত্য রীতির শিক্ষাদান করা হয়। বিংশ শতাব্দীতে এই অবস্থার পরিবর্তন হয়। নন্দলাল বসু (১৮৮২–১৯৬৬) এবং যামিনী রায় (১৮৮৭–১৯৭২) শিল্প-সাহিত্যচর্চার মাধ্যমে ভারতবর্ষের সংস্কৃতিকে নবরূপদান করেন। সমকালকে ছাপিয়ে গিয়ে কীভাবে এঁরা নিজ শৈলী গঠনে সক্ষম হন, তাঁদের চিত্রচর্চা ও দৃষ্টিভঙ্গির মিল অমিলগুলি কীভাবে শিল্পচর্চার নির্ণায়ক হয়ে ওঠে সেই আলোচনা এসে পড়ে।

## প্রথম অধ্যায় – বিংশ শতাব্দীর শিল্পচর্চার পূর্বাপর পরিস্থিতি

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ব্যক্তিগত ইচ্ছায় ভাগ্যান্বেষণ এবং অর্থ উপার্জনের বেশকিছু ব্রিটিশ শিল্পী ভারতবর্ষে আসেন। এঁরা সম্পদ ও সুখ্যাতি লাভ করলেও এদেশীয় বহমান শিল্পধারার কোন গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটিয়ে স্থিতিশীল পরিপূর্ণতায় অভিব্যক্ত করতে পারেননি। ভারতবর্ষের দরবারি শিল্পীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে ব্রিটিশ শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় তাঁদের চাহিদা পূরণ করতে গিয়ে 'কোম্পানি শৈলী' নামে এক ধরনের মিশ্র রীতির সৃষ্টি করেন। বাংলায় এই রীতিকে মুর্শিদাবাদ ও কলকাতা দুটি পর্বে ভাগ করা যায়। অন্যদিকে দেশীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত লোকায়ত ধারাটি নাগরিক সভ্যতার সঙ্গে মিশে গিয়ে কালীঘাট পট শৈলীর জন্ম দেয়। বটতলার ছাপাছবির প্রসার এবং দেবদালানে তৈলচিত্রের ব্যবহার বৃদ্ধি পেলে কালীঘাটের পটের জনপ্রিয়তা হ্রাস পায়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ত্রিশের দশকের গোড়ার দিক থেকে কলকাতা এবং অন্যান্য রাজ্যে গড়ে ওঠা চারুকলা সংস্থাগুলিতে পাশ্চাত্য রীতির শিক্ষাদান চলতে থাকে। বিংশ শতাব্দীতে হ্যাভেল (১৮৬১–১৯৩৪) এবং অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৭১–১৯৫১) যুগ্ম উদ্যোগে ভারতশিল্পের পুনর্জাগরণ ঘটে এবং নবচিত্রপরিমণ্ডল গড়ে ওঠে। অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্যের মাধ্যমে নব্যবঙ্গীয় শিল্পরীতি দেশে বিদেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। নব্যবঙ্গীয় চিত্ররীতির উন্মেষ ও বিকাশ লগ্নে ভারতীয় এবং ভারতদরদী বিদেশি শিল্পরসিক, বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। নব্যবঙ্গীয় রীতির শিল্পচর্চার বিপক্ষে একদল শিল্পী পাশ্চাত্য রীতির শিল্পচর্চা করতে থাকে। বিংশ শতাব্দীতে এই দুই গোষ্ঠীর বাইরে থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১–১৯৪১), গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬৭–১৯৩৮) ও যামিনী রায় স্বকীয় রীতি উদ্ভাবন করেন।

## দ্বিতীয় অধ্যায় – লোকশিল্প অনুষঙ্গ : নন্দলাল বসু ও যামিনী রায়

লোকশিল্পের বিশেষ কতগুলি বিভাগ যেমন – পট, আলপনা, কাঁথা, পুতুল, টেরাকোটা, সরা, চালচিত্র ইত্যাদি নন্দলাল বসু ও যামিনী রায়ের চিত্রে কীভাবে প্রভাব ফেলেছে, তাঁরা তাঁদের স্বকীয়তা কতটা বজায় রাখতে পেরেছেন, এই বিষয়গুলি সম্পর্কে তাঁদের চিন্তাভাবনা কী সেই বিষয়ে আলোকপাত করার চেষ্টা করা হয়েছে অধ্যায়টিতে। নন্দলাল বসু প্রথম পটচিত্রচর্চা করেন ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ তাঁর বাণীপুরের বাড়িতে এবং ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে হরিপুরা কংগ্রেসে। প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের পথে

আলপনার গড়ন বা মোটিফের সঙ্গে উপকরণে তিনি বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনেন। দেশবিদেশের সূচীশিল্পের নমুনা নিয়ে প্রকাশিত তাঁর নক্সার বই *ফুলকারী*, ইন্দুসুধা ঘোষের (১৯০৩–১৯৯৫) *সীবনী* (১৯৩০) এবং যমুনা সেনের (১৯১২–২০০১) *সেলাইয়ের নকশা* (১৯৫১) গ্রন্থে তাঁর প্রকৃতিকে প্রাধান্য দানের প্রমাণ পাওয়া যায়। নন্দলালের বিভিন্ন লেখায় লোকশিল্পগুলি সম্পর্কে তাঁর গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়।

যামিনী রায়ের লোকশিল্পানুসারী চিত্ররচনায় পট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাঁর লেখা 'পটুয়াশিল্প' প্রবন্ধটি পট সম্পর্কিত তাঁর সুচিন্তিত মতামতকে ব্যক্ত করে। বিশ্বপ্রকৃতির নানা উপাদান অলংকরণের রেখায় প্রকাশের আগ্রহ দেখান যামিনী রায়। কেবলমাত্র আলপনার বিন্যাসে তিনি বহু ছবি আঁকেন। কাঁথায় ব্যবহৃত মোটিফ, বর্ণ বৈচিত্র্য, রেখা, পাড় অঙ্কন, উদার চেতনার দ্বারা তিনি উদ্বুদ্ধ হন। এছাড়া পুতুল, টেরাকোটা, চালচিত্র, সরাচিত্র ইত্যাদি বিভিন্ন লোকশিল্পের দ্বারা প্রভাবিত হন। নন্দলাল ও যামিনীর শিল্পচেতনায় লোকশিল্পগুলি গ্রাম্য সরল ভাবের পরিবর্তে নান্দনিক সূক্ষ্মতায় উন্নীত হয়।

## তৃতীয় অধ্যায় – বিদেশী অনুষঙ্গে নন্দলাল বসু ও যামিনী রায়

১৯২৭ খ্রিস্টাব্দের পর আঁকা নন্দলালের বেশকিছু ছবিতে দ্রুত সংহত কল্পনার প্রকাশ; তুলির তড়িৎ গতি লক্ষ করা যায়; যা ইম্প্রেশনিস্ট ছবির বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে মিলে যায়। চিন জাপান ও ভারতীয় শিল্পের মধ্যে ভাবাদর্শগত ঐক্য থাকায় নন্দলালের ছবিতে এই দুটি দেশের চিত্রকলার প্রভাব লক্ষ করা যায়। তাঁর *শিল্পকথা* (১৩৫১) ও *শিল্পচর্চা* (১৩৬৩) গ্রন্থের নানা আলোচনায় চিন-জাপানের শিল্পপদ্ধতি ও শিল্পতত্ত্ব বিষয়ক নানা তথ্য উঠে আসে। পাশ্চাত্য শিল্পের কিছু তত্ত্বের সঙ্গে তিনি একমত হতে না পারলেও বিশ্বভারতীর উদারপন্থী শিক্ষাদর্শে তাঁর তত্ত্বাবধানে প্রাচ্য পাশ্চাত্য উভয় ধরনের শিল্পচর্চা একত্রে করা সম্ভবপর হয়। তিনি মনে করতেন ভারতশিল্পে যা নেই তা যদি পাশ্চাত্য শিল্পে থাকে তাহলে তাকে গ্রহণ করতে কোন বাধা নেই।

১৯০৩ থেকে ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এক দশকের থেকেও বেশি সময় কলকাতার শিল্পবিদ্যালয়ে পাশ্চাত্য রীতিতে শিক্ষা গ্রহণ করার সুবাদে যামিনী রায়ের চিত্রে পাশ্চাত্য রীতির ব্যপক

প্রভাব লক্ষ করা যায়। একাডেমিক, ইম্প্রেশনিস্ট, পোস্ট ইম্প্রেশনিস্ট রীতির সরাসরি ব্যবহার ছাড়াও তাঁর লোকশিল্পধর্মী ছবিগুলিতে বিভিন্ন ধরনের আধুনিক পাশ্চাত্য শিল্পতত্ত্ব কিউবিজম, পয়েন্টিলিজম, ফবিজম, বাইজেন্টাইন মোজাইকের প্রভাব লক্ষ করা যায়। কেবলমাত্র পাশ্চাত্য তত্ত্ব নয় পাশ্চাত্য বিষয়কেও তিনি গ্রহণ করেছিলেন। তিনি যে স্বল্প সংখ্যক মূর্তি রচনা করেছিলেন তার মধ্যেও পাশ্চাত্য শৈলীর প্রভাব সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

## চতুর্থ অধ্যায় – চিত্র-সাহিত্য : নন্দলাল বসু ও যামিনী রায়

গ্রন্থ অলংকরণ ও প্রচ্ছদ চিত্রণে সাহিত্য ও শিল্পের যুগলবন্দী পরিলক্ষিত হয়। নন্দলাল বসু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১–১৯৪১) ও অন্যান্য বহু সাহিত্যিকদের গ্রন্থ অলংকৃত করেছেন। গ্রন্থচিত্রণের ক্ষেত্রে তাঁর শ্রেষ্ঠ অবদান স্বাধীন *ভারতের সংবিধান* অলংকরণ। যামিনী রায় খুব বেশি সংখ্যক গ্রন্থের প্রচ্ছদ রচনা না করলেও একথা স্বীকার করতে হয় তাঁর রচিত প্রচ্ছদগুলি ব্যতিক্রমি।

নন্দলাল ও যামিনীর আঁকা ছবি বা তাঁদের ব্যক্তিত্বের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বহু সাহিত্যিক কলম ধরেছেন। বেশ কিছু চিঠিপত্রে এবং *শিল্পচর্চা*-এর 'ছবির ছড়া'য় নন্দলালের কাব্য রচনার প্রমাণ পাওয়া যায়। এছাড়া পাঠ্যপুস্তক ও শিল্পপুস্তক, শৈব-শাক্ত অন্যান্য কাহিনি, রামায়ণ-মহাভারত ও কৃষ্ণলীলার কাহিনি, চৈতন্য-বুদ্ধ-খ্রিস্ট চরিত, কিংবদন্তী, প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্য, ঐতিহাসিক কাহিনির চিত্রায়ণ করে সাহিত্যের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করেন নন্দলাল। যামিনীও রামায়ণ, কৃষ্ণকাহিনি, পৌরাণিক ও লৌকিক দেবদেবী বিষয়ক কাহিনি, খ্রিস্ট কাহিনির চিত্রায়ণ করে সাহিত্যের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করেছেন। বেশ কিছু পত্রে কবিতার আদলে তিনি তাঁর অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছেন।

নন্দলাল ও যামিনী দু'জনেই নাট্যমঞ্চে তথা নাট্যজগতের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করে চলেছেন। রবীন্দ্রনাট্যের উপস্থাপনাকে ভিত্তি করে নন্দলাল মঞ্চপরিকল্পনা, মঞ্চসজ্জা ও কলাকুশলীদের অঙ্গসজ্জায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন ও অভিনবত্ব আনেন। যামিনী রায়ের স্মৃতিচারণায় তৎকালীন সময়ের থিয়েটার ও কলাকুশলীদের সম্পর্কে বহু তথ্য ও ব্যক্তিগত মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়।

বিংশ শতাব্দীর প্রাকলগ্নে চিত্রসাহিত্যচর্চার যে বাতাবরণ সৃষ্টি হয় নন্দলাল ও যামিনী তাকে সমৃদ্ধ করেন। নন্দলালের শিক্ষা ও দর্শনের সঙ্ঘবদ্ধ রূপ প্রকাশ পায় *শিল্পকথা, শিল্পচর্চা, রূপাবলী*

(১৩৫৬) এবং *ফুলকারীতে*। *শিল্পকথা* গ্রন্থে শিল্পসাধনা, শিল্পের গতিপ্রকৃতি, আদর্শ, উদ্দেশ্য ইত্যাদি নিয়ে বহু প্রশ্নের আলোচনা পাওয়া যায়। রচনাগুলিতে নন্দলালের অর্ন্তদৃষ্টি, বিশ্লেষণধর্মী মন, সাবলীল উপমা ব্যবহার, অননুকরণীয় সহজ-সরল ভারহীন বাচনভঙ্গি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থটি নাতি বৃহৎ হলেও এটিতে এমনই অনেক মৌলিক ভাবনা নিহিত রয়েছে যা ক্রমে শব্দার্থ থেকে বৃহত্তর ভাবার্থের দিকে নিয়ে যায়। নন্দলাল *শিল্পচর্চা* গ্রন্থটি রচনা করেন শিল্পশিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয়তার কথা ভেবে। গ্রন্থটিতে চিত্ররচনার যাবতীয় করণ-কৌশল যেমন – রঙ, তুলি, আঠা বা মিডিয়াম, কাঠের ও কাগজের পাটা, ইটালি-নেপালি-সিংহলি, তিব্বতি ও অজন্তার ভিত্তিচিত্র, জগন্নাথের পট, তিব্বতি টঙ্গা, ওয়াশ-লিপ্ত ও রেশমি কাপড়ের উপরে অঙ্কনের পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন। প্রাণচ্ছন্দ সম্পর্কে গাছপালা, বিভিন্ন প্রাণী ও জীবনের ভাবভঙ্গি অংশে বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে। বিভিন্ন ধরনের ছবি অঙ্কনের পদ্ধতি, রেখা ও রঙের প্রয়োগ সম্পর্কে চিত্রও সহকারে আলোচনা করেছেন। *ফুলকারী* গ্রন্থটি সূচীশিল্পের নকশা সম্বলিত। *রূপাবলীর* তিনটি খণ্ডে প্রাচীন শিল্পসমূহের আদর্শ এবং শিল্পীর নিজ অভিজ্ঞতার মেলবন্ধন লক্ষ করা যায়। গ্রন্থের ছবিগুলি প্রাচীন শ্রেষ্ঠ শিল্পসৃষ্টিসমূহের অনুসারী হওয়ায় এগুলির অনুশীলনে ছন্দের বোধ ও ছন্দের দখল ক্রমশ বর্ধিত হতে পারবে বলে তিনি মনে করেন। নন্দলালের লেখাগুলি শিল্পীর অভিজ্ঞতা, অনুভব ও দার্শনিক মনের চরিতকথা। লেখাগুলি কোনো সাহিত্যিকের নয় তাই সাহিত্যগুণের বিচার করা অপ্রাসঙ্গিক। লেখক নিজেও এই বিষয়ে সতর্ক করে বলেছেন এসব বিষয়ে পড়াশোনার চেয়ে দেখা এবং দেখার চেয়ে করা ভালো। নন্দলাল ছাত্র-ছাত্রী, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব ও বহু পরিচিত মানুষদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পোস্টকার্ড অথবা পূর্ণাঙ্গ চিঠির সাহায্য নিয়েছেন। পোস্টকার্ডের একপাশে ছবি এঁকে বা কোলাজ করে তাঁর নিচে বা আরেক পাশে দু-চার কথা লিখেছেন। এইগুলিতে তাঁর দরদী মন, দায়িত্ববোধ, প্রকৃতি চেতনা, স্বদেশ চেতনা, ভ্রমণ বৃত্তান্ত এবং শিল্পতত্ত্বজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়।

যামিনী রায়ের সাহিত্যিক বন্ধুরা তাঁকে সাহিত্যসৃষ্টির জন্য অনুরোধ করলেও তিনি এ ব্যাপারে আগ্রহ দেখাননি। তাঁর লেখা ‘পটুয়া শিল্প’ ও ‘রবীন্দ্রনাথের ছবি’ প্রবন্ধ দু’টি দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক অনুলিখিত এছাড়া ‘ছেলেবেলা’, ‘স্মৃতিকথা’ ও ‘নন্দলাল বসু’ শীর্ষক স্মৃতিকথাগুলিও বিভিন্ন সাহিত্যিকের দ্বরা অনুলিখিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। ‘পটুয়া শিল্প’ প্রবন্ধটি পাঠ করলে পট-পটুয়া,

তাঁদের শিল্প সৃষ্টির প্রাচীনত্ব, স্থায়িত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব এবং এই সম্পর্কে শিল্পীর ব্যক্তিগত মতামত জানতে পারা যায়। 'রবীন্দ্রনাথের ছবি' প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্রনাথের ছবির মূল্যায়ন করেছেন আধুনিক, উদার এবং অভিনব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। তাঁর মতে রবীন্দ্রনাথের ছবি অ্যানাটমিবোধ সম্মত, ভাববৈশিষ্ট্যের লক্ষণ বিশিষ্ট, সংকেতধর্মী খাঁটি ইউরোপীয় আঙ্গিকের সৃষ্টি। দুটি প্রবন্ধতেই প্রাগৈতিহাসিক যুগের ছবি, ইউরোপীয় রীতি ও ভারতীয় রীতির বিশেষত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। যামিনীর চিঠিপত্রগুলি তাঁর দর্শন ও মূল্যবান মন্তব্য, ব্যক্তিগত, সমাজতাত্ত্বিক ও শিল্পতাত্ত্বিক আলোচনায় সমৃদ্ধ। বাক্য গঠন ও ভাষা ব্যবহারে তাঁর চিঠিগুলি অনেক সময় জটিল ও দুর্বোধ্য মনে হয়েছে। কখনো তিনি দার্শনিকের মতো আবার কখনো নিতান্ত ঘরোয়া ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করেছেন।

## পঞ্চম অধ্যায় – নন্দলাল বসু ও যামিনী রায়ের তুলনামূলক আলোচনা

নন্দলাল ও যামিনীর শিল্পচর্চার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের মতাদর্শ, রাজনৈতিক বিশ্বাস ও ব্যক্তিত্বের দিক থেকে তুলনামূলক আলোচনায় দেখা যায় বিংশ শতাব্দীর এই দুই শিল্পী স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে ভারতীয় শিল্পকে মর্যাদার আসনে সমুন্নত করেছেন। এঁরা দুজনেই লোকশিল্পের বিভিন্ন আঙ্গিক যেমন পট, আলপনা, সূচীশিল্প ইত্যাদি নিয়ে চর্চা করলেও ভাবনার প্রয়োগ ও পরিসর ভিন্ন ছিল। যামিনী পটচিত্রের সহজ সরল আঙ্গিকের আড়ালে থাকা শুদ্ধসত্যের সন্ধান করেন। নন্দলালের কাছে পট কখনো বিনোদনের উপায় হিসাবে, কখনো দ্রুত কাজ সারার সর্বোত্তম উপায় হিসাবে ব্যবহৃত হয়। আলপনা অঙ্কনের ক্ষেত্রে যামিনী সাবেক ধারাটিকে বজায় রেখে নতুনত্বের সন্ধান করেন আর নন্দলাল সাবেক ধারাটিকে প্রাধান্য দেওয়া জরুরি মনে করেননি। যামিনী তাঁর চিত্র রচনার মধ্যে কাঁথার বুনন, মোটিফ এবং ধরনকে প্রাধান্য দেন। নন্দলাল সূচীশিল্পের মধ্যে প্রকৃতি চেতনাকে যুক্ত করেন এবং ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের সূচীশিল্পের মেলবন্ধন ঘটান।

যামিনী বিদেশি শিল্প মূলত পাশ্চাত্য রীতিতে শিল্পচর্চা শুরু করলেও স্থিতু হন স্বদেশের মাটির শৈল্পিক বিশেষত্বে। অন্যদিকে নন্দলাল ভারতীয় পরম্পরায় শিল্পচর্চা শুরু করেন এবং ভারতীয়ত্ব বজায় রেখেই প্রাচ্য-পাশ্চাত্য রীতি পদ্ধতির প্রয়োজন মতো আত্তীকরণ ঘটান। নন্দলালের গ্রন্থচিত্রণ ও প্রচ্ছদচিত্রণ সাহিত্যিক বোধ সম্মত, কবিতা বা গ্রন্থের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং অর্থবোধক। যামিনীর

প্রচ্ছদ অলংকরণের সঙ্গে গ্রন্থমধ্যস্থ ভাবের বা সাহিত্যের কোন সংযোগ নেই বলে অনেকে মনে করলেও তা সর্বাংশে সঠিক নয়। যামিনী রায় সংক্রান্ত দক্ষিণারঞ্জন বসুর লেখা, বিষ্ণু দেকে লেখা যামিনী রায়ের চিঠি এবং তাঁর আঁকা প্রচ্ছদগুলির বিশ্লেষণে বিষয়টি স্পষ্ট হয়। এই দুই শিল্পীর পরিচ্ছন্নতা ও সুচারু বোধ শিল্প থেকে জীবনযাপন সমস্ত কিছুতেই প্রভাব ফেলে।

নন্দলাল ও যামিনীর রাজনৈতিক পরিমণ্ডল ভিন্ন ছিল। নন্দলাল গান্ধিজির আদর্শ ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দ্বারা আজীবন চালিত হন। কংগ্রেস সভা সজ্জার দায়ভার গ্রহণ, রাজনৈতিক বন্দী ছাত্রছাত্রীদের প্রতি সমবেদনা সেই সত্যকেই প্রতিফলিত করে। যামিনী কলকাতার মার্কসবাদী মতাদর্শে বিশ্বাসী একদল শিল্পী গোষ্ঠীর সংস্পর্শে আসেন। তিনি সরাসরিভাবে কখনও সমসাময়িক রাজনৈতিক সামাজিক বিষয়কে স্থান দেননি ঠিকই তৎকালীন শিল্প-সংস্কৃতিচর্চায় Peoples Art-এর যে ধারণা উঠে আসছিল, তাঁর লোকশিল্পানুসারী চিত্রগুলি যেন সেই ধারণা দ্বারা অনুমোদিত। সমাজ বিভাজনের কথা মাথায় রেখে সবার ছবির দাম এমনভাবেই রাখেন যাতে ধনী নির্ধন সকলেই কিনতে পারেন।

নন্দলাল ও যামিনী লিঙ্গচেতনায় নিজ নিজ ভাবনার পরিচয় দেন। নন্দলাল ছাত্রাবস্থায় যৌন বিষয়ক শিল্প উৎপাদনে সংকোচবোধ করলেও পুরীর মন্দিরের ভাস্কর্য রক্ষকের ভূমিকায় তাঁর সেই সংকোচ বিমোচনের দিকটি পরিস্ফুট হয়। যৌনাঙ্গ নির্দেশক অনুপুঙ্খ প্রদর্শনের বদলে তাঁর কাছে মনুষ্যগুণই প্রাধান্য পায়।

শিল্পতাত্ত্বিকদের আলোচনায় নন্দলাল ও যামিনীকে কখনো কখনো বিপক্ষে দাঁড় করানো হলেও তাঁদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক সমধুর ছিল। এঁরা ভিন্ন মতাদর্শে বিশ্বাসী হলেও কিছু বিষয়ে তাঁদের মতের মিল হতে দেখা যায়। নন্দলালের লেখায় যামিনীর শিল্পভাবনাকে সমর্থনের প্রমাণ পাওয়া যায়।

## উপসংহার

নন্দলাল ভারতবর্ষের ধ্রুপদীশিল্প ধারার অনুকরণ না করে উগ্র জাতীয়তাবাদ থেকে বেরিয়ে এসে বাস্তবের সঙ্গে তাল মিলিয়ে স্বদেশকে নতুনভাবে আবিষ্কার করেন। পরবর্তী প্রজন্ম নন্দলালের কাজে অনুপ্রাণিত হয়ে স্বদেশকে খোঁজার এই তাগিদ অনুভব করেন। যামিনী সমকালীন চিত্রচর্চার থেকে

বেরিয়ে এসে আধুনিক রুচির সঙ্গে আবহমান লৌকিক ঐতিহ্যের, দেশের শিল্পের শিকড়ের সংযোগ ঘটিয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন পথ প্রদর্শন করেন। সমকালের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আদিম শিল্পরূপের অভিমুখে তাঁর এই যাত্রা আধুনিক শিল্পী-সাহিত্যিকদের নতুন পথের দিশা দেখায়। ভারতশিল্পের সঙ্গে পাশ্চাত্যশিল্পকে মিলিয়ে দেওয়া ও পৃথক করার যে প্রবণতা যামিনীর চিত্রে লক্ষ করা গিয়েছিল 'পটুয়া শিল্প' ও 'রবীন্দ্রনাথের ছবি' প্রবন্ধ দুটিতে সেই চেতনা ফুটে ওঠে। নন্দলালের গ্রন্থগুলি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে সেখানে তিনি শিক্ষক হিসাবে উত্তর প্রজন্মকে শিল্প সম্পর্কে নির্দেশ দিতে চেয়েছেন। শিল্পকে কেবলমাত্র শৌখিনতার বিষয় নয় জীবনযাপনের মাধ্যম হিসাবে তুলে ধরেছেন। আমার এই গবেষণা সন্দর্ভের মধ্যে দিয়ে নন্দলাল বসু ও যামিনী রায়ের শিল্প-সাহিত্যচর্চাকে নানা অভিমুখে দেখবার চেষ্টা করেছি।